লোকজ

উৎসব

ও

কারু শিল্প মেলা'৯৩

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

লোকজ উৎসব ও কারুশিল্প মেলা

২০থেকে ২৬ জানুয়ারী ১৯৯৩

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
গ্রন্থাগার
সংযোজন সংখ্যা ৩৭২৮
তারিখ
সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ

স্মরণিকা

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
গ্রন্থাগার
সংযোজন সংখ্যা ~~২০৫৫৮~~ ১০৮
তারিখ
সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও নারায়নগঞ্জ

সম্পাদনাঃ
কে, এম, হাবিব উল্লাহ্
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

প্রকাশনা সহযোগিতায় ঃ
১। এ, কে, এম জাহাঙ্গীর, থানা নির্বাহী অফিসার, সোনারগাঁও
২। বিশ্বনাথ সরকার, গবেষণা অফিসার, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
৩। জসিমউদ্দিন আহমদ, প্রদর্শন অফিসার, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
৪। সৈয়দ খালেকুজ্জামান, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সোনারগাঁও থানা
৫। মোঃ খলিলুর রহমান, নিবন্ধন অফিসার, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
৬। বিল্লাল আহ্মেদ, নিরাপত্তা অফিসার, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

প্রচ্ছদ অংকনঃ
জসিমউদ্দিন আহ্মেদ

ফটোগ্রাফীঃ
কে, এম, হাবিব উল্লাহ্

প্রকাশনায়ঃ
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ
তারিখঃ ২০ শে জানুয়ারী ১৯৯৩ ইং

মুদ্রণেঃ অর্কিড প্রিন্টার্স
ফোনঃ ৫০৪৪৭১, ৫০০৮০৭, ৮৬৩১৮৭

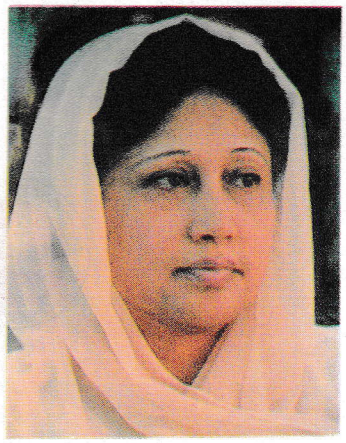

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান মন্ত্রী

বাণী

০৬ পৌষ, ১৩৯৯
২০ ডিসেম্বর, ১৯৯২

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর জাতীয় পর্যায়ে এবারই প্রথম সাতদিন ব্যাপী 'লোকজ উৎসব' এর আয়োজন করা হয়েছে। দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। লোকজ উৎসবের আয়োজন এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে একটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ।

লোকশিল্প দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম উপাদান। আমাদের রয়েছে এক গৌরবোজ্জল লোকজ ঐতিহ্য। নিজেদের পরিচিতি, সংস্কৃতি এবং অতীতকে তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতি বছর জাতীয় পর্যায়ে লোকজ উৎসবের আয়োজন করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এর মাধ্যমে দেশের জনগণ আদি, অকৃত্রিম ও সমৃদ্ধিশালী লোক ঐতিহ্য সম্বন্ধে জানতে পারবে।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সোনারগাঁয়ে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের এ উদ্যোগ সার্থক হোক—এই আমার কামনা। এ উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আমার আন্তরিক মোবারকবাদ।

খালেদা জিয়া

বাণী

বাংলার এক সময়ের রাজধানী ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সপ্তাহব্যাপী জাতীয় পর্যায়ের লোকজ উৎসব এবং কারুশিল্প মেলা কর্মসূচী। বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে এই কর্মসূচী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। আমাদের প্রাচীন লোকজ সংস্কৃতি ও কারুশিল্পের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে এই কর্মসূচী অনন্য ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া আর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই ভবিষ্যৎ এর একটি সমৃদ্ধ জীবনের প্রত্যাশায় ভাষা আন্দোলন, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ৯০ এর গণ অভ্যুত্থানের ইতিহাস সমৃদ্ধ বাংলা পঞ্জিকার একটি শতাব্দীকে আমাদের স্মৃতির ভান্ডারে সঞ্চয় করতে যাচ্ছি। লোকজ কর্মসূচীর আয়োজন এই ভান্ডারকে আরো মহিমান্বিত করবে।

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আয়োজিত এই বিশাল আয়োজনকে অনুপ্রাণিত করেছে গত বছরের তিন দিনব্যাপী বৈশাখী মেলা ও লোকজ উৎসবের সফল পরিসমাপ্তি। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দেশের লোকজ সংস্কৃতি ও কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের কার্য্যক্রমকে ঢেলে সাজিয়েছে। ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত লোক উৎসব ও শিল্পগ্রাম কর্মসূচী বিপুল সংখ্যক দেশী-বিদেশী দর্শনার্থীদেরকে আমাদের গ্রাম'বাংলার আদি ও অকৃত্রিম লোকজ ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। সপ্তাহব্যাপী লোকজ উৎসব এবং কারুশিল্প মেলার এই মহতী আয়োজন আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরো অধিক মাত্রায় দেশের লোক ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট করবে, এই কামনায়।

(অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম)
প্রতিমন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাণী

দেশে গণতন্ত্র পূনঃ প্রতিষ্ঠার পর দেশীয় ঐতিহ্য পূনরুদ্ধার ও সংরক্ষণে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যে সকল বিশেষ কর্মসূচী নেয়া হয়েছে নিঃসন্দেহে জাতীয় পর্যায়ে সাত দিন ব্যাপী লোকজ উৎসব, তিনমাস ব্যাপী কারুশিল্প গ্রাম কর্মসূচী, প্রতি শুক্রবারের লোকজ অনুষ্ঠান এবং সপ্তাহ ব্যাপী কারুশিল্প মেলা তার অন্যতম।

স্থায়ী কারুশিল্প গ্রাম কর্মসূচী এবং ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ সহ কতিপয় উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে বাংলার এককালের রাজধানী সোনারগাঁয়ে প্রতিষ্ঠিত 'লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন' এর মাধ্যমে পর্যটক ও জনসাধারনের কাছে দেশের লোকজ ঐতিহ্য তুলে ধরা সম্ভব হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং অচিরেই এই প্রতিষ্ঠানটি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। আমি এ প্রচেষ্টার সার্থকতা কামনা করছি।

২৭/১২/৯২

(ইসলাম উদ্দিন মালিক)
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পুরাতন যাদুঘর ভবন

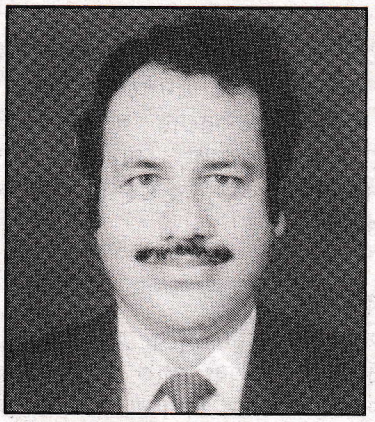

বাণী

গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন যে উদ্যোগ নিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। আমাদের লোক ঐতিহ্য খুবই সমৃদ্ধশালী। তাছাড়া সোনারগাঁয়ের মসলিন শাড়ীর খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। কাজেই ঐতিহ্যবাহী সোনারগাঁয়ে জাতীয় পর্যায়ে সপ্তাহ ব্যাপী লোকজ উৎসব ও কারুশিল্প মেলা আমাদের নিজস্ব স্বকীয়তা, ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে অবশ্যই বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে আশাকরি।

গণতান্ত্রিক এ সরকার এ দেশের জনগণের সরকার। সংস্কৃতি হচ্ছে লোকজ সংস্কৃতি। আর তাই এ সংস্কৃতিকে তুলে ধরার লক্ষ্যে সরকার বদ্ধপরিকর। সে কারণেই সরকার ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে।

আশা করি এ লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে সপ্তাহ ব্যাপী এ লোকজ উৎসব ও কারুশিল্প মেলা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমি এ অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারক বাদ।

সেই সংগে কামনা করছি অনুষ্ঠানের সফল সার্থকতা।

(অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম)
সংসদ সদস্য, সোনারগাঁও।

সোনারগাঁ এবং বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন পরিচিতি

কে, এম, হাবিব উল্লাহ
পরিচালক,
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন।

সোনারগাঁ

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে এখানেই ছিল বাংলার রাজধানী। স্বাধীন বাংলার সুলতান সিকান্দর শাহ, আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, সাধক সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের অনেক স্মৃতি বিজড়িত নানা ঐতিহাসিক নিদর্শন এখানে এখনো অতীত স্মৃতিকে অম্লান করে রেখেছে। এই সোনারগাঁ কেবল রাজনৈতিক কারণেই সুপরিচিতি ছিল না বরং সোনারগাঁয়ে বুনন করা প্রাচ্যের গৌরব বিখ্যাত মসলিন ও জামদানী বস্ত্র প্রাচীনকাল থেকেই মিশর, চীন, সিংহল, বার্মা, মালাক্কা, সুমাত্রা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হতো। এ ছাড়াও সোনারগাঁ অঞ্চলে ঝিনুকের কাজ এবং চিত্রিত এক খন্ড কাঠে তৈরী ঘোড়া, হাতী ও পুতুল সর্ব ভারতে অতি সমাদৃত ছিল। ইবনে বতুতা, মাহুয়ান, ফা-হিয়েন, র‍্যালফিচ প্রমুখ বিদেশী পর্যটক বাংলাদেশ সফর করে তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে সোনারগাঁয়ের এ ধরনের ঐতিহ্যের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

ফাউন্ডেশন পরিচিতি

অবস্থান ও বাস্তব সুবিধাদি

রাজধানী ঢাকা থেকে ২৪ কিঃ মিঃ পূর্বে ঢাকা চট্টগ্রাম মহা সড়ক থেকে দুই কিঃ মিঃ অভ্যন্তরে নারায়নগঞ্জ জেলাধীন সোনারগাঁ থানার প্রাণকেন্দ্র আমিনপুর ইউনিয়নের ইছাপাড়া মৌজায় ১৫০ বিঘা জমির উপর ইহা অবস্থিত। অচিরেই আরো ২৫ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। ফাউন্ডেশনে রয়েছে পুরানো যাদুঘর ভবন অর্থাৎ সরদার বাড়ী, প্রশাসনিক ও নতুন যাদুঘর ভবন, পাঠাগার, ভবন, ক্যাফেটরিয়া ভবন, কারুপল্লী, অফিসার ও ষ্টাফদের কোয়াটার, ৫টি পিকনিক স্পট এবং অসমাপ্ত অডিটরিয়াম, পরিচালক ও উপ-পরিচালকের বাসভবন। তাছাড়া রয়েছে প্রায় তিন কিঃ মিঃ দীর্ঘ লেক, ৩টি কাঠের সেতু, ১টি পাকা ব্রীজ ৭টি পুকুর এবং বিশালাকার উদ্যাণ ও ফলের বাগান।

প্রতিষ্ঠা

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই এদেশের লোক ঐতিহ্য সংরক্ষনের স্বার্থে লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই সোনারগাঁকেই তিনি এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং পানাম নগরের ১টি বাড়ীতে এর প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু হয়। সরকার ১২ই মার্চ, ১৯৭৫ ইং তারিখে এক রেজুলেশন বলে ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শনসমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণসহ এই শিল্পকে পুনঃজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে শিল্পগ্রাম কর্মসূচী, গবেষণা, প্রকাশনা, মেলা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কর্মসূচীর গ্রহণই হচ্ছে ফাউন্ডেশনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

উন্নয়ন কর্মকান্ড

১৯৭৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে লোক ও কারুশিল্প যাদুঘরের কাজ শুরু করা হয় এবং লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শনাদির ব্যাপক সংগ্রহ অভিযান চালানো হয়। লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে সরকার গৃহীত কর্মসূচী হিসাবে ১৯৭৭ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে 'লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর' প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে "লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর ও শিল্পগ্রাম" নামে ১৫০ বিঘা জমিতে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হয়। ১৯৯০ সালে প্রকল্পের প্রথম পর্যায় লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হয়। এখনও শিল্পগ্রাম বাস্তবায়নের অপেক্ষায়। ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি সরকার উন্নয়ন খাতে ফাউন্ডেশনকে ৪ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুরাতন যাদুঘর ভবন তথা সর্দার বাড়ীর সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে।

যাদুঘর

বর্তমান যাদুঘরটি পুরানো সর্দার বাড়ীতে অবস্থিত। মোট গ্যালারীর সংখ্যা ১০টি। সংগৃহীত নিদর্শনাদির সংখ্যা ৪০০০ এর অধিক। গ্যালারীর প্রদর্শনীতে আছে প্রায় ৮০০টি নিদর্শনাদি। ইতিমধ্যে নির্মিত নতুন যাদুঘর ভবনটি উন্মোচিত হলে তাতে নকশীকাঁথা, মসলিন ও জামদানী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গ্রন্থাগার

এখানে রয়েছে প্রায় আড়াই হাজারের উপর বিভিন্ন রকম গবেষণাধর্মী পুস্তকাদি। গত ২০শে নভেম্বর মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সাহায্যে প্রায় ১০০ জন বসে পড়ার সুবিধাসহ ১টি অত্যাধুনিক পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গবেষণা কাজে নিয়োজিতদের পাশাপাশি সাধারণ জ্ঞান আহরণকারীদের জন্য সকাল ১০ টা থেকে ৫টা পর্যন্ত তা উন্মুক্ত থাকে।

গবেষণা প্রকাশনা

গত বছর 'বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প' নামে ১টি স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছিল এ ছাড়াও এ পর্যন্ত মোট ১১টি বিভিন্ন ধর্মী পুস্তক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণাকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে নোরাড অর্থানুকুল্যে 'বৃহত্তম ঢাকা জেলার কারুশিল্প সংক্রান্ত' তথ্যাদি সংগ্রহ এবং দলিলীকরণের উপর ১টি জরীপ ও গবেষণা কাজ চলছে।

অন্যান্য কর্মসূচী

ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর প্রতি বছর পহেলা বৈশাখে ১ দিনের ১টি মেলা এবং ১৯৮২ সনে ১টি সেমিনারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। গত বছর ১লা বৈশাখে প্রথম বারের মতো তিন দিন ব্যাপী জাতীয় পর্যায়ে লোকজ উৎসব, সেমিনার এবং বৈশাখী মেলার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। এবারেই প্রথম তিন মাস ব্যাপী কারুশিল্প গ্রাম কর্মসূচী, প্রতি শুক্রবারের লোকজ অনুষ্ঠান, ৭দিন ব্যাপী জাতীয় পর্যায়ে লোকজ উৎসব এবং সাত দিন ব্যাপী কারুশিল্প মেলার আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া এখানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তিন দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক বাউল কনফারেন্স এবং প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে লোক ও কারুশিল্পীদের পুনঃজাগরণ ও আর্থিক সহায়তার জন্য 'কারুশিল্প কল্যাণ তহবিল'। তাছাড়া বিগত এক বছরে কারুশিল্প ও ফাউন্ডেশনের কর্মচারীদের বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছাড়াও আগত দর্শনার্থীদের চিত্ত বিনোদনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে নতুন কিছু সুবিধাদি। যেমনঃ নৌবিহার, প্রতি শুক্রবারের লোকজ অনুষ্ঠান, পিকনিকের বাস্তব সুবিধা বৃদ্ধি, ক্যাফেটেরিয়া প্রতিষ্ঠা- ইত্যাদি অন্যতম।

ফাউন্ডেশনের নিজস্ব রাজস্ব আয়

যদিও ১৯৭৫ সালে ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, কিন্তু বিভিন্ন কারণে বিগত ১৯৯১ অর্থ সালের পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব রাজস্ব আয়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অবদান নেই। গত অর্থ বছরে এই প্রতিষ্ঠান রেকর্ড পরিমাণ অর্থাৎ দশ লক্ষ টাকার উপর নিজস্ব রাজস্ব আয় করেছে। এই আয় লেক থেকে বরশীতে মাছ ধরা, যাদুঘরে প্রবেশ ফি, পিকনিক ফি, বিক্রয় কেন্দ্রে বিক্রিত দ্রব্যাদি থেকে আয়, ফলের বাগান বিক্রি, কার পার্কিং এলাকা লিজ প্রদান ইত্যাদি থেকে এই অর্থ এসেছে। আশা করা যায় ফাউন্ডেশনে 'মিনি বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠাকরতঃ বাউন্ডারী ওয়াল দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রবেশ পথে ন্যূনতম প্রবেশ ফি আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হলে উক্ত আয় থেকেই ফাউন্ডেশন পরিচালনা সম্ভব হবে।

জনবল

ফাউন্ডেশনের জনবল তার আয়তন এবং কার্য্যপরিধির তুলনায় খুবই অপ্রতুল। মাত্র ৭ জন অফিসার, ৪৫ জন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, ২ জন মালী এবং ২ জন সুইপারসহ মোট ৫৬ জন কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছে; যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হচ্ছেন পরিচালক। তিনি প্রেষণে নিয়োজিত থাকেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে প্রেষণে নিয়োজিত পরিচালকদের নামের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

১। জনাব সফিকুল আমীন -১৯৭৫-৮২
২। ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান-১৯৮২-৮৩
২। ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান-১৯৮২-৮৩
৩। জনাব মুহঃ নুরুন্নবী -১৯৮৪
৪। জনাব এম, এ, রশিদ-১৯৮৪-৮৬
৫। জনাব এস, কে, এম, শামসুল হক- ১৯৮৭-৯১
৬। জনাব কে, এম, হাবিব উল্লাহ-১৯৯১ (বর্তমান)

প্রযত্ন পরিষদ

ফাউন্ডেশন পরিচালনের স্বার্থে প্রতি তিন বছরের জন্য সরকার কর্তৃক কমিটির সদস্য মনোনীত হন। প্রযত্ন পরিষদের সভাপতি হচ্ছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী। এই কমিটি হচ্ছে ফাউন্ডেশন পরিচালনের নিমিত্তে সর্ব্বোচ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি।

ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রযত্ন পরিষদের বিভিন্ন সময়ের সভাপতি

১। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন-১৯৭৫-৭৬
২। ডঃ নাজমুল করিম-১৯৭৬-৭৮
৩। জনাব এ, বি, এম, সফদার -১৯৭৮
৪। জনাব সিদ্দিকুর রহমান-১৯৭৯-৮১
৫। জনাব হেদায়েত আহমেদ -১৯৮১
৬। জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ -১৯৮২
৭। জনাব আবদুল মজিদ খান-১৯৮২
৮। জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী-১৯৮২-৮৪
৯। জনাব মোমিন উদ্দিন আহমেদ -১৯৮৫
১০। জনাব মাহবুবুর রহমান- ১৯৮৬-৮৮
১১। ব্যারিষ্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ-১৯৮৮
১২। জনাব নুর মোহাম্মদ খান- ১৯৮৮-৮৯
১৩। জনাব জাফর ইমাম, বীর বিক্রম -১৯৮৯
১৪। সৈয়দ দীদার বখত-১৯৮৯
১৫। অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মদ -১৯৯০
১৬। অধ্যাপক এ, বি, এম, বদরুদ্দোজা চৌধুরী -১৯৯১
১৭। অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম - ১৯৯২ (বর্তমান)

বর্তমান প্রযত্ন পরিষদের পরিচিতি

১। প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রাণালয়- সভাপতি
২। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়- সহ-সভাপতি
৩। সংসদ সদস্য, সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ- সদস্য
৪। উইং কমান্ডার (অবঃ) এম হামিদ উল্লাহ খান- সংসদ সদস্য
৫। জনাব এ, এস, এম, সোলায়মান- প্রাক্তন সংসদ সদস্য
৬। ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, সভাপতি বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ, ঢাকা।- সদস্য
৭। জনাব সাঈদ আহমেদ, প্রাক্তন সচিব- সদস্য
৮। সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়- সদস্য
৯। সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়- সদস্য
১০। প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা- সদস্য
১১। মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা - সদস্য
১২। পরিচালক, চারুকলা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা- সদস্য

১৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, ঢাকা – সদস্য

১৪। জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ – সদস্য

১৫। পরিচালক, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন– সদস্য সচিব

প্রযত্ন পরিষদ ছাড়াও রয়েছে আরো কয়েকটি কমিটি, যা প্রযত্ন পরিষদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই তৈরী হয়েছে। কমিটি গুলোর মধ্যে প্রকল্প কমিটি, নিয়োগ উপ–কমিটি, নির্দশন সংগ্রহ কমিটি এবং গবেষণা উপ–কমিটি উল্লেখযোগ্য ।

ফাউন্ডেশনের উন্নয়নের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে করণীয় কার্যাদি

ফাউন্ডেশনের সর্বাংগীন উন্নয়নের স্বার্থে নিম্নোক্ত প্রকল্প গুলো অচিরেই বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

(ক) মিনি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা।

(খ) বাউন্ডারী ওয়াল দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ) স্থায়ী ভিত্তিক কারুপল্লী প্রতিষ্ঠা।

(ঘ) ফাউন্ডেশনের কার্য পরিধি বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আরো কমপক্ষে ২০০ বিঘা জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঙ) রেষ্ট হাউজ নির্মাণ

(চ) বর্হিঃ বিদ্যুতায়ন এবং

(ছ) পুরানো ভবনাদির সংস্কার সাধন–ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে যে কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করা অত্যাবশ্যক তা হচ্ছে প্রথমতঃ ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ নির্মাণ এবং দ্বিতীয়তঃ 'কারুপল্লী' প্রতিষ্ঠা।

'ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশে' থাকবে গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ। অঞ্চল ভিত্তিক সংস্কৃতির পরিচায়ক বৈশিষ্ট্যসূচক গ্রাম, নদীনালা, পুকুর, আঁকাবাঁকা পায়ে চলারপথ, দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ গাছপালা, টিলা পাহাড়, গ্রামীণ বাড়ীঘর, নদীনালা এবং বাংলাদেশের বিচিত্র নৌকার সারি। এছাড়াও থাকবে বাংলাদেশের উপজাতীয় অঞ্চলের মিনিরূপ অর্থাৎ বাংলাদেশের সামগ্রিক লোক সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে 'ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ' গড়ে উঠবে। যে কোন দেশী বিদেশী দর্শনার্থী একনজরে এই 'ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ' পরিদর্শন কালে উপলব্ধি করতে পারবে সোনার বাংলার শাশ্বতরূপ।

'কারুপল্লী' কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের দক্ষ ও প্রতিভাবান কারুশিল্পীগণের লোকশিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে দর্শনার্থীগণ প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হবেন। বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট সম্পদ হচ্ছে ঐতিহ্য সমৃদ্ধ লোকশিল্প। পল্লীজীবন ভিত্তিক লৌকিক আচার আচরণ ও উৎসবের উপর ভিত্তি করেই যার সৃষ্টি। নগরায়ন শিল্পবিপ্লব এবং পশ্চিমা বিশ্বের সাংস্কৃতিক প্রভাব বলয়ের ফলশ্রুতিতে ঐতিহ্যময় গ্রামীণ সমাজকেন্দ্রিক লোকশিল্প আজ যে ধ্বংসের মুখামুখী তা এ কারুপল্লী এবং ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কিছু না কিছু হলেও পুনরুজ্জীবিত হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তবেই স্বার্থক হবে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। স্বার্থক হবে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের লালিত স্বপ্ন।

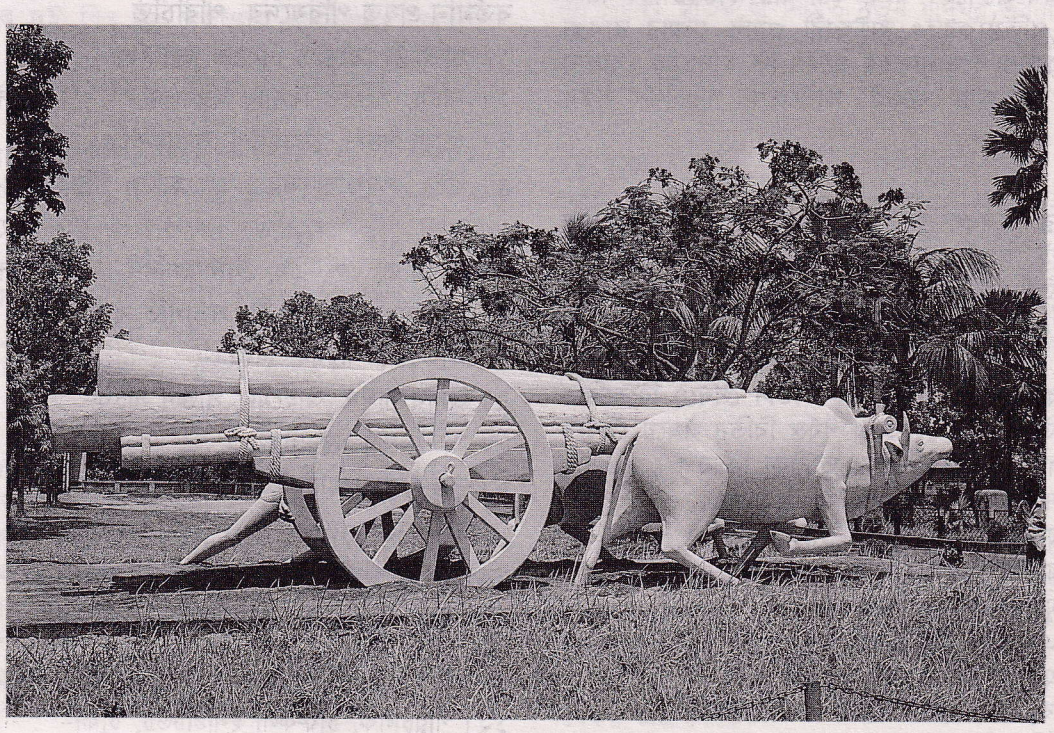

এক নজরে

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

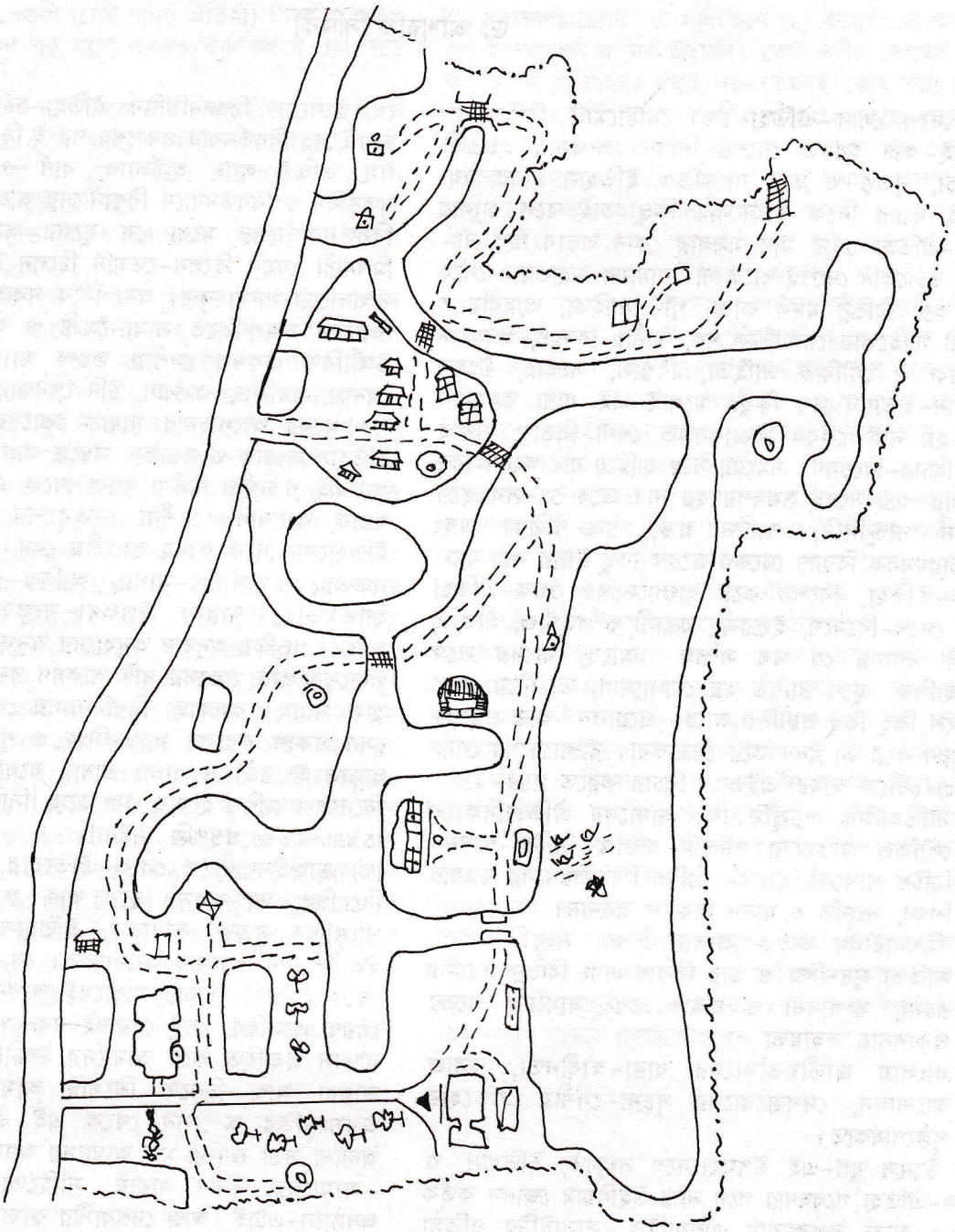

ফাউন্ডেশনের সীমানা	
পুরাতন যাদুঘর (সর্দার বাড়ী)	
পাকা রাস্তা	
প্রশাসনিক ও যাদুঘর ভবন	
নির্মীয়মান মিলনায়তন	
লোক ও কারুশিল্প গ্রন্থাগার	
নামাজের ঘর	
পরিত্যক্ত মন্দির	
বিক্রয় কেন্দ্র	

উন্মুক্ত মিলনায়তন	
কারুশিল্প গ্রাম	
পিকনিক স্পট	
গণ শৌচাগার	
পুকুর	
হ্রদ	
পায়ে চলার পথ	
পাকা সেতু	
কাঠের সেতু	

নৌকার ঘাট	
কেয়ার টেকার ভবন	
অফিসার্স কোয়াটার	
ষ্টাফ কোয়াটার	
পরিচালক ও উপপরিচালক ভবন	
সুইস গেইট	
লোকজ উৎসবের মঞ্চ	
কাদায় গরুর গাড়ী	
ফুলের বাগান	

আমাদের লোক ঐতিহ্য

ডঃ আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

বাংলাদেশে লোক-ঐতিহ্য-চর্চ্চা মোটামোটি ব্রিটিশ যুগ থেকেই শুরু হয়-এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজী সাহিত্য, নৃতত্ত্ব ও তার সাংস্কৃতিক ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়েই ঘরের দিকে তাকালো। কিন্তু তাই বলে বাংলার লোক-ঐতিহ্য-চর্চার মাল মসলার কোন অভাব ছিল না- যেমন তা কোন দেশেই থাকে না। রামায়ণ-মহাভারত থেকে শুরু করে বিভিন্ন মঙ্গল কাব্য, পুঁথি সাহিত্য, আরবীয় ও ফারসী সাহিত্যের রোমান্টিক গল্প, স্থানীয় বিবরণ, প্রবহমান মৌখিক ও লৌকিক সাহিত্য, বিশ্বাস, সংস্কার, উৎসব অনুষ্ঠান-ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যেই এই ধারা প্রবহমান ছিল-হয় নাই কেবল বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণী-বিভাগ, সংগ্রহ এবং বিচার-বিশ্লেষণ। সময়ের সঙ্গে হারিয়ে যায় অনেক কিছু যা আর পরে সংগ্রহ সম্ভবপর হয় না। তবে সে-সব স্থলে প্রাচীন পান্ডুলিপি, প্রাচীন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা এবং স্মৃতিচারণমূলক বিবরণ থেকেও অনেক কিছু উদ্ধার করা যায়। লোক-ঐতিহ্য, বিশেষ করে বাংলাদেশের লোক-ঐতিহ্য নিয়ে দেশে-বিদেশে, ইংরেজী, ফরাসী ও পর্তুগীজ, গ্রীক ও আরবী ভাষায় যে সব সম্পদ আছে, যাদের সঙ্গে ঐতিহাসিক যুগে স্থাপিত হয় যোগাযোগ, তা নিয়ে দেশে বিদেশে কিছু কিছু গ্রন্থাদিও আছে- প্রয়োজন আজ গ্রন্থপুঞ্জি অনুসরণ করে তা খনন করে বের করা। বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য চর্চাকে আমরা এইভাবে বিচার করতে পারি-

১। ঐতিহাসিক পটভূমি (ক) আমাদের ঐতিহাসিক ও লৌকিক ঐতিহ্যের পটভূমি-বাংলায় ব্রিটিশ শাসন- ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব- ব্রিটিশ সিভিলিয়নদের বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানস বিকাশে অবদান।

২। মিশনারীগণ কর্তৃক বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, কলা, সাহিত্য মুদ্রণশিল্প ও তার বিকাশ এবং বিভিন্ন গ্রন্থাদির রচনা, সম্পাদনা ও প্রকাশ এবং সাময়িক পত্রের প্রকাশনায় সহায়তা

৩। বাংলায় জাতীয়তাবাদের ধারা-স্বাধীনতা, স্বরাজ আন্দোলন, দেশত্মবোধের সূচনা-দেশীয় ঐতিহ্যের পৃষ্ঠপোষকাত।

(ক) উন্মেষ যুগ-এই উপমহাদেশে সংস্কৃতি, ইতিহাস, ও লোক-ঐতিহ্য গবেষণার পথে স্যার উইলিয়াম জোনস কর্তৃক ১৭৮৪ অব্দে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা দেশীয় বিদেশী গবেষকদের কাছে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিল। ১৭৭৮ অব্দে লণ্ডনে ফোকলোর সোসাইটির প্রতিষ্ঠা- পত্রিকা ও গ্রন্থাদির প্রকাশ-সূর্যাস্ত ব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তরুণ সিভিলিয়নদের এসব সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে প্রশাসনিক প্রেরণাদান, যার ফলে রংপুরে স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন, জি এইচ ড্যামেন্ট, অনত্র হান্টার, ডালটন, লে- উইন, রিজলী প্রমুখ এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে উইলিয়াম কেরী, উইলিয়াম মর্টন, রেভা, জেমস লঙ্ এবং দেশীয় ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীগণও এগিয়ে আসতে লাগলেন।

(খ) ইংল্যান্ডে বিজ্ঞানভিত্তিক ঐতিহ্য-চর্চা শুরু হ'ল-যখন ডারুইনের বিবর্তনবাদ প্রকাশের পর ই,বি, টাইলর, ফ্রেজার, গম, এন্ড্রিউ ল্যাং, হার্টল্যাণ্ড, বার্ণ ও অন্যান্য অসংখ্য নৃতত্ত্ববিদ ও বিবর্তনবাদে বিশ্বাসীদের আগমন ঘটলো। এই বিবর্তনবাদীদের মধ্যে সে যুগের অসংখ্য সিভিলিয়ন, মিশনারী যেমন ছিলেন-তেমনি ছিলেন দেশীয় নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সদস্য বৃন্দ। অন্য দিকে নব্যস্বাজাত্যবাদ ফরাসী বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণীতে উজ্জীবিত একদল দেশীয় তরুণ ম্যাক্সমূলর, থিয়ডোর বেনফা, ব্লুমফিল্ড, কাওএল, টনি পেনজার, এড্‌গারটন প্রমুখ শত মুখের আলোচনার মাধ্যমে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য- ইতিহাস সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠলো।

(গ) এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে এদেশে স্বাধীনতা ও স্বরাজ আন্দোলন-দেশীয় নেতৃবৃন্দের দেশীয় ঐতিহ্য- ইতিহাসের দিকে আগ্রহ ভারতীয় বেদ-পুরাণ, বৌদ্ধজাতক পঞ্চতন্ত্র; কথাসারিৎ-সাগর, আলিফ-লায়লা, শাহনামা, হাতিমতাই, পারস্য উপকথা-সংস্কৃত সাহিত্য-প্রকৃত সাহিত্য প্রভৃতির অনুবাদ অনুবাদের অনুবাদ-লোক ঐতিহ্যের গুরুত্বের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলো। শুরু হ'ল সংগ্রহ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রকাশ করলেন ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা। এ ছাড়াও ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় যথেষ্ট গ্রন্থাদি দেশে ও বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে [সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য, (১৯৭৮-'৮০) গ্রন্থপঞ্জি দ্রষ্টব্য]।

(ঘ) ডারুইনবাদীগণ লোক-ঐতিহ্যের যে-ভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছিল, তা অগ্রসর হয়ে আজ ফ্রয়েডিয়ান মনঃস্তত্ত্ব, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, তুলনামূলক ধর্ম ইত্যাদি নানা আলোয় আলোকিত। যে ব্রিটিশ জাতির কাছ থেকে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমেই আপন ঐতিহ্যকে জানার প্রেরণা এসেছিল, সেই প্রেরণাই নব্য-স্বজাত্যবোধের দক্ষিণ বাতাস প্রবাহিত করে আমাদের উজ্জীবিত করে চলেছে। আমরা আজ চিনতে শিখেছি আমাদের ঐতিহ্যকে- অপসংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে এই ঐতিহ্যবোধ বিশ্বের অন্যান্য সভ্য জাতির মত আমাদের অগ্রসর করে নিয়ে যাবে -আমাদের জীবন ধারায়, সাহিত্যে, শিল্পে, উৎসবে, অনুষ্ঠানে-এটাই আজ দেশবাসীর কাম্য।

রবীন্দ্রনাথ দেশের তরুণ ছাত্র সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন।

'দেশের কাব্যে, গানে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে... গ্রাম্য পার্বনে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষি কুটিরে, প্রত্যক্ষ বাস্তবে, স্বাধীন চিন্তা ও গবেষেণার দ্বারা জানিবার জন্য, শিক্ষার বিষয়কে কেবল পুঁথির মধ্যে হইতে মুখস্ত না করিয়া বিশ্বের সঙ্গে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্যে তোমাদিগকে আহবান করিতেছি' ...

রবীন্দ্রনাথ এখানে আবহমান বাংলাদেশের ঐতিহ্যকে-তার অপার উদার দিগন্তবিথারী শস্য শ্যামলা জনপীঠ থেকেই

স্বাধীন চিন্তার মাধ্যমে উপলব্ধি করতে বলেছিলেন। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দুঃখ করে বলেছিলেন আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতে সেগুলি (সেই সুবর্ণ ঐতিহ্য) বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে বহু সহস্র এখনও কালিকলমে ধরা পড়ে নাই...।

... বাতাসের মধ্যে বাস করে যেমন আমরা ভুলে যাই যে বায়ু সাগরে আমরা ডুবে আছি, তেমনই পাড়াগাঁয়ে থেকেও আমাদের মনে হয় না যে এখানে কতবড় সাহিত্য ও সাহিত্যের উপকরণ ছড়িয়ে আছে।

দীর্ঘদিন পূর্বে বিখ্যাত ব্রিটিশ প্রশাসকও লেখক স্যার চার্লস মেটকাফও বলেছিলেন-

বাংলার গ্রামগুলি-সে যেন নিজেরাই এক একটা রিপাবলিক-সবই আছে-নেই শুধু সুপরিচালক-থাকলে ব্রিটিশ ইংল্যাণ্ডের বহু পূর্বেই তার খ্যাতি সুদুরপ্রসারী হত। তিনি এড়িয়ে গেছেন যে কথাটা, অর্থাৎ পলাশী প্রান্তরে যদি এদেশের স্বাধীনতা সুর্য অস্তমিত না হ'ত-ঐক্য-শৃঙ্খলা এবং প্রশাসনিক পর্যায়ে যদি পূর্ব পুরুষগণ আদর্শ হতেন, তবে এই বাংলাই হত পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ-যেমন হয়েছে আজ নিকটপ্রাচ্য-দূরপ্রাচ্যের দেশগুলি। জ্ঞান-বিজ্ঞান নদীর মত, তা কোথাও সীমাবদ্ধ থাকে না, ঐশ্বর্য এবং শৃঙ্খলা থাকলে তা বাংলাদেশেও হিজরত করতো যেমন বহু অনগ্রসর দেশে তা হয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলতে চান, এদেশে ব্রিটিশের আগমণ আমাদের শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত করেছে। আমরা সেখানে একমত নই। স্বাধীনতার সূর্য এবং ঐশ্বর্যের দীপাবলী না নিভলে সোনার বাংলা বিজ্ঞানকে আনতো যুগ, ইতিহাস এবং সময়ের প্রয়োজনেই। এবং বহু অনুন্নত দেশেই তা হয়েছে-প্রমাণ চারদিকেই বিরাজমান। এটি আজ সর্বসম্মত একটি থিয়োরী যে, যে জাতি তার ঐতিহ্য সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল নয়,-তার মধ্যে দেশাত্মবোধ আশা করা যায় না-নানা দিকের নানা প্রলোভনময়ী আকর্ষণে তারা হারিয়ে যায়-এ যেন নিজের মাকে ভুলে অন্যের মাকে মা ডাকা। প্রতিটি জাতির জিহবা ও মননই তার আবহমান খাদ্য-খাবার, ভাষা এবং উৎসব-অনুষ্ঠানে নিজেকে খুঁজে পায়-তার পোশাক-পরিচ্ছদ-যাই কেন হোক না।

আমাদের মনে রাখতে সংস্কৃতির সংজ্ঞা হল 'সাম টোটাল অব দি ট্রাডিশন অব এ নেশান- এই ট্রাডিশন বা ঐতিহ্যও তিনটি সূত্রে অগ্রসর হয়-

(১) অ্যাকালচারেশন বা সাঙ্গীকরণ (২) বরোইং বা ঋণ এবং (৩) ইনোভেশন বা নব উদ্ভাবন। কোন নদীর স্রোতেই যেমন শুধু আপন বারিধারার প্রবাহ নয়-তেমনই কোন সভ্য জাতিই কেবল তার প্রাগৈতিহাসিক জীবন ধারা আকড়ে থাকে না-আদিবাসী সমাজও নয়। বিদ্যুতের আলোকে কেউ কি অস্বীকার করবেন? এই আলোর নিচেই সমাজ সংসার চলবে মানুষ চন্দ্রে যায়, তাও মানতে হবে। আমাদের পূর্ব পুরুষগণ কাঁচা মাংস খেতেন, আমরা এখন তা খাই না। কিন্তু আমাদের জীবনধারা, উৎসব, আনন্দ, নববর্ষ, বিবাহ, চাষবাস, পশুপালন আমরা সেইভাবেই করছি তাতে এ্যাকালচারেশন, বরোইং, এনোভেশন আগেও ছিল, এখনও আছে-এ চলবে। কিন্তু বিদেশী কোন জীবনাদর্শ এনে আমরা যদি আমাদের আবহমান সংস্কৃতিকে ভুলে যাই, তবে তার নাম হবে পরাধীনতা-আগ্রাসন। আমরা কাউকে গ্রাস করতে চাইনা আগ্রাসিতও হ'তে চাই না।

আজকের ফোকলোর বা লোক-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান এসব প্রশ্ন ও সমস্যারই জবাব দিয়ে চলেছে-লোকবিজ্ঞান অতীতমুখী নয়-বরং অতীতকে পর্যালোচনা করে সে ভবিষ্যতের সমাধান দেয়। একটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অতি সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সে তার ভবিষ্যৎ সমন্ধেও অঙ্গুলি সংকেত করতে পারে। এজন্য লোকবিজ্ঞানে আজ এসেছে কমপ্যারেটিভ বা তুলনা মুলক থিয়োরী ২) ন্যাশনাল বা জাতীয়তাবাদী থিয়োরী ৩) অ্যানথ্রলজিক্যাল বা নৃতাত্ত্বিক থিয়োরী ৪) সাইকো অ্যানালিটিক্যাল বা মনো-বিজ্ঞানমূলক থিয়োরী ৫) রিচুয়াল বা আনুষ্ঠানিকমূলক থিয়োরী ৬) ষ্ট্রাকচারাল বা আঙ্গিকগত থিয়োরী ৭) ফিল্ড মেথড বা সংগ্রহ-বিজ্ঞান ইত্যাদি যার উপর অজস্র গ্রন্থ বের হয়েছে-আমাদের লোক-সাহিত্যমূলক গ্রন্থাবলীতে এ সম্বন্ধে বহু আলোচনাও হয়েছে।

দেশবাসী যদি তার গুরুত্ব অনুভব করে এ সম্বন্ধে যত্নবান হন-নিজকে ও নিজের দেশকে আবিষ্কার করতে বের হন-এক্ষুণি- এই মুহূর্ত থেকে-তবেই দেশে নব্য স্বজাত্যবোধের এক দক্ষিণ বাতাস প্রবাহিত হবে।

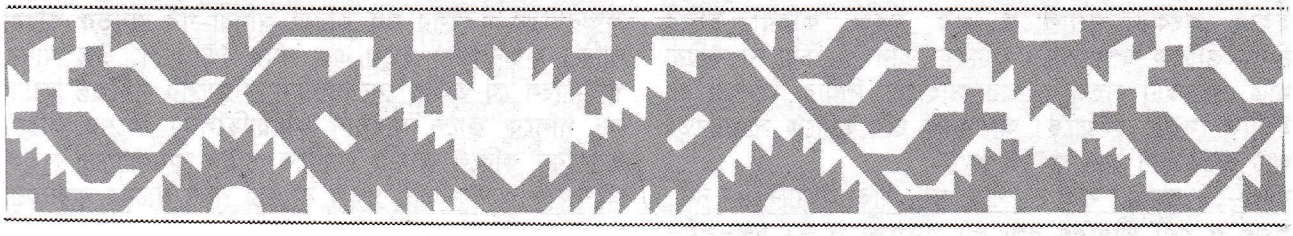

পল্লী শিল্প

কবি জসিমউদ্দীন

চাঁদের আলোকে সকল ধরনী দেখা যায়। কিন্তু সে আলো আমাদের গৃহের অন্ধকার দূর করে না। সেখানে একটি ক্ষুদ্র মাটির প্রদীপের প্রয়োজন। বাহির হইতে অনেক জ্ঞান-গবেষণার সহিত আমরা পরিচিত হইয়াছি, কিন্তু মাটির প্রদীপের মত নানারূপ গ্রাম্য শিল্পকলা আমাদের গৃহকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। পল্লীর শিল্পকলা সাধারণতঃ রূপ পাইয়াছে মাটিতে, পাথরে, কাঠে, কাপড়ে, মানুষের দেহে, কাগজে, বেতের বন্ধনীতে কোথাও রঙীন রেখা হইয়া, কোথাও কঠিন দাগ কাটিয়া, আবার কোথাও রঙীন সূত্রের মায়াজাল রচনা করিয়া ইহারা কেহ মানুষের অংগে জড়াইয়া আছে, কেহ বা গৃহের বিবিধ আসবাবপত্রের মধ্যে লুকাইয়া আছে; কখনও আবার ধর্মের পঞ্চ প্রদীপের আলোকে উজ্জ্বল পথের পথিক হইয়া মানুষের সহজ সৌন্দর্য্যস্পৃহার একান্ত সাথী হইয়া আমাদের গৃহে রূপের শতদল সাজাইয়াছে।

মাটির গায়ে আলপনার রেখায় আমরা যে ছবি দেখিতে পাই সেই রূপ ছবিই আমরা দেখিতে পাই পাথরের ফলকে, ছুতার মিস্ত্রির কারুকার্যে আঁকা কাষ্ঠখন্ডে, দেহের উল্কীতে, গহনায়, রঙীন কাঁথায় এবং গৃহের সুক্ষ্ম বেত্র বন্ধনীতে। ছবি তোলার প্রণালী পৃথক পৃথক স্থানে পৃথক হইলেও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে। এই সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়া আমাদের দেশের বিভিন্ন স্তরের শিল্পীদের মধ্যে একটি মিলন সেতু গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহারা যেন একই প্রেরণা লইয়া আছে। পথে ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই কাহাকেও ছাড়িয়া যায় নাই। যে মেয়েটি রঙের উপর রঙ মিশাইয়া পিঁড়ি চিত্র করে, গ্রাম্য পটুয়ার আঁকা রথের গায়ের রঙীন ছবিরও সে একজন বড় সমঝদার। মাটির মেঝেতে কাঁথা বিছাইয়া কৃষাণ গৃহিনী রঙীন সূত্র ধরিয়া যেসব লতাপাতা, প্রজাপতি ফুল আঁকে হয়ত ঘর বাঁধিতে বাঁধিতে তাহার কৃষাণ স্বামী তাহারই অনুকরণে সুক্ষ্ম বেত জড়াইয়া চালের বাতার সহিত পরদা বন্ধনী গোখুরা বন্ধনী প্রভৃতি রচনা করিয়াছে।

মাটির গায়ে যেসব পল্লী শিল্প রূপ পাইয়াছে তাহার মধ্যে আলপনার কথা সকলের আগে মনে পড়ে। এই আলপনার আর্ট কতকটা হিন্দু মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন ব্রত বা পূজা পার্ব্বণ ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে ইহার প্রচলন দেখা যায় না। গরীবের ঘর নিকাইয়া চালচিত্র আঁকিয়া তাহাকে মনের মত করিয়া সাজাইয়া তবে দেবতাকে সেখানে আহবান করিতে হইবে। মাটির উপরে চালের গুড়া গোলার রেখা ফুলের মত বেশীক্ষণ ইহাদের বাঁচাইয়া রাখা যায় না। তাই ইহার অংকন প্রণালীকে খুব সহজ করিয়া ছবির বিষয়বস্তুটিকে সম্পূর্ণভাবে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা না করিয়া মাত্র কয়েকটা সহজ রেখার সাহায্যে শিল্পীর মনোভাবের ইংগীত দেওয়া হইয়াছে। আলপনার ছবি গুলিকে সাধারণতঃ আট ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

যথাঃ-১। পদ্ম ২। লতা ৩। গাছ, ফুল, পাতা ইত্যাদি।৪। নদী, পুকুর ও পল্লী জীবনের দৃশ্য ৫। পশুপক্ষী ও ৬। চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র। ৭। আভারণ ও নানা আসবাব ৮। পিঁড়িচিত্র।

সাধারণতঃ লক্ষ্মীপূজায় তারা ব্রতে ভাদুলীব্রতে, বসুধারা ব্রতে এবং গ্রাম্য বিবাহের উৎসবে আলপনা আঁকার প্রচলন দেখা যায়। ইহাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রকমের আলপনা আঁকিতে হয়। যেমন তারা ব্রতে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রের ছবি প্রধান, আবার লক্ষ্মীপূজায় বিবিধ প্রকারের লক্ষ্মীর পদচিহ্ন। ইহাদের প্রত্যেকটি উৎসব উপলক্ষ করিয়া যেমন নানা রকমের আলপনা তেমনি নানা রকমের গান ছড়া। ময়মনসিংহ গীতিকার কাজল রেখা পালা হইতে প্রাচীন আলপনার একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

উত্তম শালি ধানের চাল জলে ভিজাইয়া ধুইয়া রাজকন্যা কাটিয়া লইলেন। তাহা পিঠালী করিয়া প্রথমে বাপ আর মায়ের চরণ অংকিত করিলেন। তারপর জোড়া 'টাইল' ধানছড়া তার মাঝে মাঝে গৃহলক্ষ্মীর পদচিহ্ন, শিবদুর্গা, কৈলাসভবন, পদ্ম পত্রে লক্ষ্মীনারায়ন হংস রথে বসিয়া জয়া বিষহরি, ডরাই, ডাকুনী, সিদ্ধা বিদ্যাধরী, শ্যাওড়ার বন সমেত বনদেবী, রক্ষাকালী, বাহনসহ কার্ত্তিক গণেশ, লক্ষণের সহিত রামসীতা, গংগা গাদারবী, হিমালয় পর্ব্বত, পুস্পকরথে বসিয়া বসিয়া ইন্দ্র যম সমুদ্র সাগর চন্দ্র সূর্য, জঙ্গলের মধ্যে ভাঙা মন্দির ইত্যাদির চিত্র মাটিতে আঁকিয়া ঘৃতের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া রাজকন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। এই ধরনের আলপনা আঁকার পদ্ধতি আজকাল মেয়েরা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছেন। যশোহর অঞ্চল হইতে সুধাংসু বাবু যেসব আলপনা আবিষ্কার করিতেছেন তাহা কতকটা এই ধরনের।

মাটির গায়ে যেমন আলপনা তেমনি মাটি দিয়ে কুমারেরা বিচিত্র রকমের হাঁড়িকুড়ি, লক্ষ্মীর সরা, প্রদীপ, জোড় খুটি, নানা দেবদেবীর প্রতিমা ও বহু প্রকারের পুতুল তৈরী করিয়া থাকে। কোন কোন কুমার গৃহিনী চিত্রবিদ্যায় বেশ নিপূণ। তাহারা বিবাহের বরণডালার নক্সী কুলা এবং পিঁড়ি চিত্র করিয়া বেশ দু'পয়সা আয় করিয়া থাকে। পুরুষেরা সাধারণতঃ কাদাছানার কঠিন কাজটি সম্পাদন করিয়া দেয়। মেয়েরা পুরুষদের তৈরী কাদার ডেলার উপর সুক্ষ্ম কারুকার্য করে। লক্ষ্মীপূজার সরার উপর তুলি ধরিয়া তাহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকিয়া দেয়। এসব ছবি সাধারণতঃ রাধাকৃষ্ণের যুগল মুর্ত্তি কিংবা দূর্গা মহাদেব ইত্যাদি দেবদেবীর প্রতিকৃতি। কুমার মেয়েরা ছাড়াও গ্রামের বহু হিন্দু মেয়ে বিবাহের বরণকুলা সরা এবং পিঁড়িতে অতি সুন্দর চিত্র আঁকিতে পারে।

মাটির পুতুল সাধারণতঃ কুমারদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তৈরী করিয়া থাকে। এইসব পুতুল কোথাও নানারূপ ছাচেঁর সাহায্যে, আবার কোথাও শুধু হাতেই তৈরী হয়। কলিকাতার নিকটবর্তী কুমারেরা ছাঁচের সাহায্যেই পুতুল তৈরী করিয়া থাকে।

কৃষ্ণনগরের পুতুলের গল্প করিয়া আমরা গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। কৃষ্ণনগরের পুতুল এক সময় ইউরোপে এত আদর পাইয়াছিল যে তৃতীয় নেপোলিয়ান সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কুমার যদু পালকে ফ্রান্সে আহবান করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিলে আমরা দেখিতে পাইব কৃষ্ণনগরের পুতুল অপেক্ষাও অনেক ভাল পুতুল বাংলার নানা গ্রামের কুমারেরা

তৈরী করিয়া থাকে। কৃষ্ণনগরের পুতুলকে খাঁটি বাংলা পুতুল বলিয়াও উল্লেখ করা যায় না। কৃষ্ণনগরের কুমারদের এত নাম এই জন্যই যে, তাহারা বিজাতীয় রুচির খোরাক জোগাইতে পারিয়াছে। বস্তুতঃ ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে নীল কুঠীর সাহেবদের চাহিদা অনুসারে কৃষ্ণনগরের কুমারেরা এদেশী আদর্শ ছাড়িয়া ইউরোপীয় আদর্শে পুতুল গড়িতে আরম্ভ করে। তখন হইতে তাহারা এদেশীয় সমাজজীবনের নানা ফটোগ্রাফীর নক্সা তৈরী করিয়া বিদেশে চালান দিয়া আসিতেছে।

এইখানে সোলার খেলনার কথা না বলিয়া পারিলাম না। গ্রাম্য মেলা বা আড়ং হইতে ছেলেরা সোলার খাচা, পাখী, কুমীর, রথ, আনারস, কাঁঠাল, হরিণ, ময়ূর, ফুল প্রভৃতি কিনিয়া আনে। সোলার খেলনা সাধারণতঃ খুব ছোট শিশুদের জন্য। শিশুকে শোয়াইয়া রাখিয়া তাহার মাথার উপর খেলনাগুলি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। সেগুলি বাতাসে দোলে। তাহা দেখিয়া শিশু দু' হাত নাড়িয়া খেলা করে। ইহা ছাড়া সোলার খেলনা ঘর সাজাইবার কাজেও ব্যবহৃত হয়। দেশী জমিদারদের কাচারীতে পুন্যাহ উৎসবে প্রজাদের গলায় এক প্রকার সোনার মালা পরাইয়া দেওয়া হয়। আগে মুসলমানদের বিবাহের সময় বরকে এক ছাতি মাথায় দিয়া শ্বশুর বাড়ী যাইতে হইতো। আজকাল মোটরে চড়িয়া, পাল্কীতে চড়িয়া আধুনিক বরেরা বিবাহ করিতে যায়, কিন্তু আগেতো লোকের এসব দিকে শখ ছিল না। গ্রাম্য মালাকরেরা মাসের পর মাস অতি নিপূণ হস্তে ধরিয়া ধরিয়া সোলার ফুল পাতা লতা পাখী ইত্যাদি দিয়া এই রঙীন ছত্রের রচনা করিতো। এই ছত্র হস্তে লইয়া পদব্রজেই বর বিবাহ করিতে যাইত। শিবরামপুরে এক বৃদ্ধ মালাকর এখনও এইরূপ ছাতি তৈরী করিতে পারে। দূর্গাপূজার মেলার সময় নৌকার ব্যাপারীরা সোলার লতা ফুল দিয়া মালা দিয়া নৌকার গলই সাজায়। দৌড়ের নৌকাও সোলার লতা ফুল দিয়া সাজান হইয়া থাকে। হিন্দুদের বিবাহে বরের মাথার টোপর মালাকরেরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। কোন কোন টোপরে এত সুক্ষ্ম কারুকার্য থাকে যে তাহা বহু মূল্যে বিক্রীত হয় মালাকরেরা সাধারণতঃ স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া কাজ করিয়া থাকে। সোলা কাটিবার জন্য এক প্রকার পাতলা ছুরি এবং বটি ইহারা গ্রাম্য কামারদের কাছ হইতে তৈয়ার করিয়া লয়। আজকাল পাটের চাষ হওয়ায় সোলার চাষ খুব কম হয়। ব্যবসায়ে লাভ নাই দেখিয়া জীবিকার জন্য বহু মালাকর অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে।

কাপড়ের উপর যেসব পল্লী শিল্প ধরা দিল কাঁথা তার মধ্যে প্রধান। আল্পনার মতন কাঁথা সেলাইয়ের ছবিগুলিকেও নানা ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যথাঃ-১। বিবিধ লতা ২। পাতা ফুল ৩। মাছ পাখী ৪। দেবদেবীর ছবি ৫। হাতী ঘোড়া ময়ূর ইত্যাদি। কাঁথার উপরে যেমন নানা রকমের ছবি হয়, সেইগুলি আঁকিবার জন্যও নানা রকমের ফোঁড় দিবার প্রণালী আছে। তাহারা নিজেরাই অনেক সময় ছবির উপর ডেকোরেশনের কাজ করে। এই সেলাইগুলির নাম তেরছা সেলাই, বখেরা সেলাই, বাঁশপাতা সেলাই ইত্যাদি। বেশীর ভাগ কাঁথাতে লাল, কাল, সাদা ও হলদে এই চারি রঙের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন কাঁথাতে সবুজ ও নীল রঙ দেখিতে পাই।কাঁথা সেলাইয়ের সুতা তৈরী এবং রঙ নির্বাচন এক কঠিন ব্যাপার। কেহ কেহ পুরাতন শাড়ীর পাড় হইতে একটি একটি সুতা বাহির করিয়া ছোট ছোট নাটাইয়ে গুটাইয়া রাখে। তারপর সেই সুতাকে পাকাইয়া বা একটি একটি দ্বারা কাঁথা সেলাই করে। হাট হইতে তাঁতীদের বা বনেদের কাছ হইতেও কেহ কেহ রঙীন সুতা কিনিয়া লয় হাটু মেলিয়া বসিয়া পায়ের আঙ্গুলের সঙ্গে সুতার একটি আল জড়াইয়া দুই হাতে সাধারণতঃ মেয়েরা সুতার প্যাচ দেয়। এক আলে পাক হইতে তাহা দাঁত দিয়া কামড় দিয়া ধরিয়া অন্য আলে পাক দেয়। এইরূপে নানা রঙের আট নয় আল সুতা পাক দেওয়া হইলে এক এক আল হাতের চারি আঙুলে একত্র করিয়া তাহাতে জড়াইয়া দড়ি করিয়া পাক দিয়া রাখে। কাপড়ে ফুল তুলিতে মেয়েরা কোলের উপর রাখিয়া তা সেলাই করে। কেহ কেহ ফ্রেমেও কাপড় আটকাইয়া লয়। কিন্তু কাঁথা সেলাই সেভাবে করিতে হয় না। ঘরের মেঝেয় মাদুরের উপর কাঁথাখানা মেলিয়া ধরিয়া তাহার উপরে বসিয়া তবে তাহা সেলাই করিতে হয়। সাধারণতঃ দুই পাট কিংবা তিন পাটের কাঁথাই নক্সী করা হয়। তাহার অপেক্ষা বেশী পাটের কাঁথা শীত নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাহার উপরে কেহ কারুকার্য করে না। কাপড়ের প্রত্যেক পরদকে পাট কহে। দুই পাটি কাঁথার অর্থ দুই পাল্লা কাপড় যে কাঁথায় ব্যবহৃত হয় সেই কাঁথা। এই কাঁথা সেলাইয়ের সমস্ত উপকরণ সাধারণতঃ ছোট ছোট বটুয়ার মধ্যে রাখা হয়। সূঁচে মরিচা ধরিবে মনে করিয়া কেহ কেহ তাহা তেলের শিশির মধ্যেও রাখে। এই সূঁচ মেয়েদের নাক কান বিধাইবার কাজেও ব্যবহৃত হয়।

কোন কোন সময়ে একখানা কাঁথা সেলাই করিতে বার বছর সময় লাগিয়াছে এরূপও শোনা যায়। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীহাটে একখানা ভাল কাঁথার খোঁজ পাইয়াছিলেন। সেই কাঁথায় একটি বিধবা মেয়ে তাহার বিবাহের গায়ে হলুদ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ঘটনা আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন। এরূপ শোনা যায় যে, মাতা যে কাঁথা সেলাই করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মায়ের মৃত্যুর পর কন্যা তাহা আজীবন সেলাই করিয়াও শেষ করিতে পারেন নাই। তাহার মৃত্যু হইলে বংশের পরবর্তী কোন কন্যা তাহা সমাপ্ত করিয়াছেন। ইহা কম ধৈর্য্যের কথা নহে। আগে এই সব কাঁথা কেহই বিক্রী করার জন্য তৈরী করিত না। লোককে দেখাইয়া প্রিয়জনকে উপহার দিয়া গ্রাম্য শিল্পীরা সুখী হইত।

কাঁথা সেলাই করিতে এদেশের মেয়েরা কাপড়ের উপর কাঁথার মতই নক্সা করিয়া আরও অনেক জিনিস তৈয়ার করিয়াছেন, সেগুলিকে কাঁথা সেলাইয়ের পর্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে। যথাঃ-১। পান সুপারি রাখার বটুয়া ২। জপের মালার থলে ৩। বৈরাগীর ঝোলা ৪। বালিশ যাহাতে মাথার তেল লাগিয়া ময়লা না হইয়া যায় তজ্জন্য তাহার উপরে আচ্ছাদন দেওয়ার 'ব্যটন'। 'ব্যটন' বোধ হয় বেষ্টনী শব্দের অপভ্রংশ। ৫। মুসলমানদের দস্তরখানার কাপড়। মুসলমানেরা সাধারণতঃ বিছানার উপর বসিয়া আহার করে। আহারের সময় মাছের কাঁটা আলু খোসা ইত্যাদি ফেলিবার জন্য একখানা দস্তরখানা কাপড় বিছাইয়া দেওয়া হয়। বাড়িতে কোন নতুন অতিথি আসিলে সাধারণতঃ তাহার আহারের সময়ই নক্সী করা দস্তরখানা কাপড় বিছান হয় ৬। কোরআন শরীফ জড়াইয়া রাখার ঝোলা ৭। সারীন্দা (এক

প্রকার বাদ্যযন্ত্র) রাখিবার ঝোলা।
পল্লী গ্রামের শিকা আর এক সুন্দর জিনিষ। ছোট একখানা খড়ের ঘরের চালের বাতায় আনন্দ লহরী ফুলঝড়ি, আদরফালা, সাগর ফেনা, কেলীকদম্ব প্রভৃতি নানা ধরনের শিকায় রঙ্গীন 'পানের বাটা' গহনার ঝাঁপি সিন্দুর কোটা প্রভৃতি মেয়েদের অতি শখের জিনিসগুলি দুলিতে থাকে। কোন কোন শিকার বুননের সহিত অভ্র ও রাংতা ব্যবহৃত হয়। শিকায় শিকায় গরীব চাষীদের ছোট ঘরখানি ঝলমল করে। বিছানা বালিশ টাঙাইয়া রাখিবার জন্য আগে মেয়েরা রঙীন সুতা দিয়ে ঝালি তৈয়ার করে। তাও দেখিতে অতি সুন্দর। আজকাল মাটির প্রদীপের চলন উঠিয়া গিয়াছে। এই প্রদীপের সলিতা রাখিবার জন্য আগে মেয়েরা রং-বেরঙের কাপড় দিয়া সলিতাদানী তৈরী করিতেন। তাহাতেও নানা প্রকার সুক্ষ্ম কারুকার্য থাকিত। বাংলাদেশের পাটার উপর যেসব ছবি দেখা যায় সে সম্বন্ধে একটি কথা বলিব। বাংলাদেশের বুকে একদিন মাটির মাদল বাজাইয়া যে সুন্দর মানুষ দেবতা অশ্রুজলে মন্দাকিনী বহাইয়া ছিলেন তাহারই উজ্জ্বল ইতিহাস সাধারণতঃ এই সময়ের পুঁথির পাতায় বা মলাটের পাতায় অংকিত দেখিতে পাই। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও তিরোভারে পূর্বে এই ধরনের ছবি আঁকা পুঁথি বাংলাদেশে খুব কমই পাওয়া যায়। কালিঘাটের পট লইয়া আজকাল অনেকে আলোচনা করিতেছেন। এই পট আঁকিবার পদ্ধতি অতি চমৎকার। পটুয়াদের ঘরে ছেলে বুড়ো মেয়ে সকলে বসিয়া পট আঁকে। প্রত্যেকে এক একটি রং লইয়া বসে। একজন রেখা টানে আর একজন গায়ে রং দেয়, অন্যজন চুল আঁকে। এমনি করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে একখানি পট সম্পূর্ণ আঁকা হয়। ইহাতে সকলেরই শিক্ষা এবং সৃষ্টির আনন্দ জন্মে। আমাদের দেশে যাহারা প্রতিমার চালচিত্র আঁকে তাহাদের ভাস্কর বা আচার্য্য ব্রাহ্মণ বলে। ইহারা গ্রামের সকল প্রকার চিত্রকার্য সম্পাদন করেন। আমাদের ফরিদপুরে চৌধুরীদের রথের গায়ে এরূপ একজন ভাস্করের আঁকা অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। তাহারা কতকগুলি দেবদেবীর লীলা বিষয়ক, আবার কতকগুলি পল্লী জীবনের নানা ঘটনা সম্বলিত। আজকাল জামেনী হইতে ছাপামারা চালচিত্র বাজারে বিক্রি হইতেছে দেখিয়া দেশী ভাস্করদের উপার্জনের পথ সংকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।
চারি বৎসর আগে কবি পরিমল চন্দ্রঘোষ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, আগে বিক্রমপুর জেলার গ্রাম্য মুসলমানেরা এক প্রকার গাজীর পট দেখাইয়া বাড়ি বাড়ি ঘুরিত। আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়া এই পটের খোঁজ পাইয়াছি। পট এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। যে ছড়াটি গাহিয়া এই পট বাড়ি বাড়ি দেখান হইত তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলামঃ

রাবণ আইস্য যোগীর বেশে সীতা হরণ করে
সুপর্ণখার নাক যেমন লক্ষণ ঠাকুর কাটে।
কামরতি বামন দেখেন ছিন্নমস্তা কালী
তার পরেতে দেখেন কর্ত্তা ময়ূর পঙ্খী নাও।
গাজীর ভাই কালু আইল নিশান ধরিয়া
গাজীর আছে একটা বাঘ নাম যে খান্দিয়া।
ঘর দুয়ার দুলিয়া বাঘে মানুষ লইয়া যায়।
চুল নাই বুইড়া বিটি খোপার লাইগা কান্দে
কচু পাতা টিপলা দিয়া খোপা ডাঙর করে।
সুন্দর বুইনা বাঘ ছিল আড়ে আড়ে চায়।
তারা বুইনা বাঘ যেমন সেলাম জানায়।
পালের প্রধানবড় আবালটা বাঘে লইয়া যায়।
সাত সের চাইলের পিঠা খাইল বুড়ী কাঁথা মুড়ি দিয়া।
দাঁতটিং দাঁতটিং বইলা বুড়ী জামাই বাড়ী যায়।
গোটা দুইতিন কিল দিল বুড়ীর আসরে পাসরে
গোটা চার পাঁচ কিল দিল বুড়ীর গুষ্টার উপরে
নন্দঘোষের বাপে আইল হুক্কা হাতে লইয়া।
দুই বাঘের এক মাথা ধরিছে যুগান।

বর্ণনা পড়িলে সহজেই মনে হইবে এই পটে হিন্দু মুসলমান সকল প্রকার লোকেরই রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। এই পট সাধারণতঃ প্রস্থে দুই হাত এবং দৈর্ঘ্য ত্রিশ চল্লিশ হাত একটা বাঁশের সংগে পট জড়াইয়া দুইটা বাঁশের সংগে তাহা বাঁধিয়া দেওয়া হইতো। তাহারা থামের কাজ করিত। গানের সংগে সংগে থিয়েটারের সিনের মত ধীরে ধীরে উপরের বাঁশ কপি কলের সাহায্যে ঘুরাইয়া ছবিগুলিকে মেলিয়া ধরা হইতো। গ্রামের লোকেরা তাহা দেখিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িত। কোন কোন দলে সাজ পোশাক পরিয়া ছবির বিষয়বস্তুগুলি দেহভংগীর সাহায্যেও দেখানো হইতো। এরূপ দলকে কাঁচের দল বলে সাধারণতঃ পৌষ মাঘ মাসে এরূপ দল বাহির হইয়া থাকে। গুরু সদয় দত্ত বীরভূম জেলা হইতে রামায়ণ মহাভারতের ঘটনা সম্বলিত এইরূপ কয়েকখানা পট সংগ্রহ করিয়াছেন।
বাংলাদেশে এককালে বেত ও বাঁশের কঞ্চির সাহায্যে ঘরের নানা প্রকার আসবাব ও ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যসামগ্রী তৈরী করা হইতো। আমাদের শীতল পাটি এক আশ্চর্য্য জিনিস। যাহারা পাটি বোনে তাহাদিগকে (পাইটা) বলে। পাটিয়া মেয়েদের মধ্যে যে যতগুলি পাটি বুননের যোবা প্রণালী জানে বিবাহে সে তত কুড়ি টাকা পণ পায়। ফরিদপুর জেলার সাতৈরের শীতল পাটি একদিন সমস্ত ভারতে প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার পাটি রাজা সীতা রামের পুরবাসিনীদের মধ্যে একটা বিলাসের সামগ্রী বলিয়া পরিচিত ছিল। উত্তরবঙ্গে অনেক স্থানে এখনও বেতের দ্বারা সম্পূর্ণ গৃহ নির্মাণ করা হয়। ঢাকা জেলার বেতীয়া রমণীদের হাতের তৈরী একটি বেতের ঝাঁপি ও পান রাখিবার একটি ডালা আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। বেত ঘুরাইয়া সুক্ষ্ম ফুল বানাইয়া তাহাতে রং লাগাইয়া কি অপূর্ব দ্রব্য তাহারা তৈরী করে।
আজকাল ফরগেট টিনের আমদানী হইয়া সুন্দর খড়ের ঘরের শখ মানুষের চলিয়া যাইতেছে। সেই সংগে ভাল ভাল ঘরামীরাও ঘরের সুক্ষ্ম কাজ ভুলিয়া যাইতেছে। জোড় বাঙলা, বারো বাংলা, বারোদুয়ারী, পূর্ব দুয়ারী, আট চালা, দোচালা, চৌচালা ঘর, রঙমহল, আলম টুংগী, বলটুংগী প্রভৃতি ঘরের নাম শুনিলে কান জুড়াইয়া যায়। ইহার এক এক রংয়ের সংগে এক এক রকমের কারুকার্য।
আমাদের ফরিদপুর জেলা হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে কালুখালি অঞ্চলের ছরাজান মিয়া বহু বৎসর আগে একখানা খড়ের ঘর তৈরী করাইয়া গিয়াছেন। আজও তিনচারি দিনের পথ হইতে লোক গামছায় চাল চিড়া বাঁধিয়া এই ঘর দেখিবার জন্য আসে। শুনিয়াছি তাহার বাড়ির কোন নববধু নাকি শ্বশুর বাড়িতে পাকা ঘর নাই বলিয়া পাড়া গাঁয়ে আসিতে চাহেন নাই। শ্বশুর তাই প্রতিজ্ঞা করিলেন খড় দিয়া তিনি এমন ঘর

বাঁধিবেন যাহা পাকা বাড়ির সৌন্দর্য্যকেও পরাস্ত করে। এই ঘর তৈরীর বিষয়ে নানারূপ গল্প আছে। যে ঘরামী একদিনের একটি রুয়া চাঁচিয়াছে তাহাকেও গৃহকর্তার মনঃপুত হয় নাই। ইহার প্রত্যেকটি রুয়া এত ধরিয়া ধরিয়া চাঁচা হইয়াছে যে, একটি রুয়া চাঁচিতে একজন ঘরামীর দুইদিন সময় লাগিয়াছে। সর্ব্বাইন্দা গ্রামের দুইজন নমঃশুদ্র ঘরামীর তত্ত্বাবধানে প্রথমে এই ঘরের কাজ আরম্ভ হয় পরে ঢাকা জেলা হইতে একজন মুসলমান ঘরামীকেও নিযুক্ত করা হয়। শোনা যায় যে, এই ঘরামী এত সরু বেত চাঁচিতে পারিতো যে, তাহা অনায়েশে সূঁচের ছিদ্র পথেও যাওয়া-আসা করিত। তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য ত্রিশ চল্লিশ জন ঘরামীকে নিযুক্ত করা হইয়াছিলো। ঘরের কাজ সমাধা হইলে গৃহস্বামী হিন্দু দুইজন ঘরামীকে পুরস্কার এবং জায়গীর প্রদান করেন। কিন্তু মুসলমান ঘরামীকে পরে নিযুক্ত করা হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে আর কোন পুরস্কার দেওয়া হয় নাই। ইহাতে সে মনঃক্ষুন্ন হইয়া ঘরের মধ্যে একস্থানে একটু ফাঁক রাখিয়া যায়। বৃষ্টি পরিলেই সেখান দিয়া জল গড়াইয়া পড়িত। অপর দুইজন হিন্দু ঘরামী পরে বহু চেষ্টা করিয়াও সে ত্রুটি সারিতে পারে নাই। এই ঘরের প্রত্যেকটি রুয়া প্রায় ত্রিশ হাত। এতবড় রুয়া জোড়া না দিয়া তৈরী করিবার জো নাই। কিন্তু সেই রুয়া বাঁশের সংগে এমন করিয়া মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কিছুতেই তাহা টের পাওয়া যায় না। ঘরের আটনের জোড়াও বুঝিবার উপায় নাই। এই ঘরের সংগে গোখুরা বন্ধন পরদা বন্ধন (প্রজাপতি বন্ধন) প্রভৃতি নানা প্রকার বন্ধন আছে। তাছাড়া ঘরের বাজারের সংগে ফুসীর সংগে, ছাটনের সংগে অভ্র ও মীনার পাত জড়াইয়া তাহাতে সুচিক্করণ বেতের কারুকার্য করা হইয়াছে। আটনের সংগে যে মোটা বেতের বন্ধন দেওয়া হইয়াছে সেই বেতের গায়ে সাদা রং লাগান। প্রত্যেক রুয়ার গোড়ায় লতা ও ফুলের নক্সা কাটা তাহাতে নীল এবং লাল রং জড়ানো। এখন এই ঘরের অবস্থা কতকটা জীর্ণশীর্ণ। অভ্র ও রং বেরংয়ের মীনার পাতগুলি উঠিয়া গিয়াছে। গ্রামের বৃদ্ধরা বলে, আগে এই ঘরের ভিতরে দাঁড়াইয়া উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অভ্র এবং মীনার পাতের রঙে চোখ ঝলসিয়া যাইত। রাত্রিবেলা এই ঘরে যখন ঝাড় লণ্ঠন জ্বলিত তখন মীনা ও অভ্রের পাতের উপর নানা রকমের বন্ধনগুলি সাগরের নানা রঙের জল লহরীর উপর তারকার প্রতিবিম্বের মত আলোকে ঝলমল করিত।

এই ধরনের ঘর আজকাল কেহ তৈরী করে না বটে, কিন্তু গ্রামের বহু বাড়িতে এখনও এরূপ কারুকার্য সমন্বিত ফুলচং দেখিতে পাওয়া যায়। রূপকথার অনেক স্থানে পাওয়া যায় কোন কোন ঘরে আন্ধারী অভ্র দিয়া তৈরী হইত। সোনা দিয়া তাহার রুয়া মোড়া হইত। নানা রূপ পাখীর রঙীন পালকে সেই ঘরের ছাউনি দেওয়া হইত। মলুয়ার পালা হইতে আমরা একজন সাধারণ গ্রাম্য চাষীরা ঘরের বর্ণনা উদ্ধৃতি করিব।

শীতল পাটি দিয়া বিনোদ ঘরের দিল বেড়া,
উলু ছোনে ছাইল ঘর দেখতে মনোহরা।
ঝাপে ঝোপে করে বিনোদ কামেলার কাম
দেখিতে সুন্দর বাড়ী চান্দের সমান।
মাছুরা পক্ষের পাখা দিয়া সাজুয়া বানায়।

বাংলাদেশের দারুশিল্প তাহার সর্বাপেক্ষা গৌরবের জিনিস। এ দেশের পল্লী গ্রামে ভ্রমণ করিলে অতি সহজেই চোখে পড়িবে, সাধারণ ছুতার মিস্ত্রী কাঠের উপর কত অপূর্ব কারুকার্য করিয়া রাখিয়াছে। ঘরের চৌকাঠ, কাঠের বেড়া, খাট, পালঙ্ক, সিন্দুক, বাক্স, লাঠি, সারিন্দা দোতারা, কাঠের ও বাঁশের গুড়ির হুক্কা, রথ পাল্কী, গাড়ী, শ্রাদ্ধের বৃষ কাষ্ঠ প্রভৃতি সব জিনিসের উপরই এই সব শিল্পীরা সৌন্দর্য্যের শতদল ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ফরিদপুর জেলায় নৈলাগ্রামে সেদিন একখানা ঠাকুরের আসন দেখিয়া আসিলাম। চার কোণে চারিটি হাতি। প্রত্যেক হাতির মাথায় এক একটি সিংহ। সিংহ হাতীর সুর বাকাইয়া ধরিয়াছে। তাহারই উপরে আসনখানা অবস্থিত। আসনের সামনের দিকটা মাথায় করিয়া আছে চারিজন বৈরাগী। একজনের হাতে কমন্ডুল, আর একজন হরিপ্রেমে মাতোয়ারা, আর দুইজন তীর্থ যাত্রা করিয়াছে। আসনখানার চারিদিকে চারিজন পরী পাখা মেলিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। সামনের দিকে ব্রজগোপিনীরা কেহ নাচিতেছে, কেহ তবলা বাজাইতেছে, কেহ গান করিতেছে। প্রত্যেকটি ছবি যেন জীবন্ত। এই আসনের উপরে আর একখানা ক্ষুদ্র আসন এবং তাহার উপরে আরও একখানা। প্রত্যেক আসনের চারি ধার কাগজের সুক্ষ্ম ঝলমের মত তক্তার উপর কারুকার্য করিয়া সাজানো হইয়াছে। ইহা ছাড়া এই আসনের চারিপাশে রাধাকৃষ্ণ, দশাবতার ও রামের বহু চিত্র অংকিত রহিয়াছে। তাহা কোন গ্রাম্য পটুয়ার আঁকা। সামনের দিকের ছবিগুলি প্রায় মুছিয়া গিয়াছে। অন্যদিকের ছবিগুলি এখনও বোঝা যায়। শুনলাম বহু শিল্পীর বহু বৎসরের সাধনায় এই আসনখানি তৈরী হইয়াছিলো। বাংলাদেশে পল্লী গ্রামে বেড়াইলে শ্রাদ্ধের বহু স্তম্ভ দেখা যায়। ইহার উপরে গঠিত বৃষ, হরপার্ব্বতী এবং স্তম্ভরূপী মনুষ্যমূর্তি কোন কোন স্থানে অতি সুন্দর হইয়া থাকে। এদেশে ভাল পাথর পাওয়া যায় না, তাই বাংলায় ভাস্কর শিল্প দারুশিল্পে রূপান্তরিত হইয়াছে। (হ্যাভেল)

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে এক বৃদ্ধ মুসলমান খুব সুন্দর সুন্দর কাঠের পানের বাটা তৈরী করে। তাহার গায়ে রঙীন লতাপাতা ও ফুল আঁকা হয়। এক কিশোরগঞ্জ ছাড়া আর কোথাও এরূপ পানের বাটা আমরা দেখি নাই।

লোকজ উৎসবের
সার্বিক সাফল্য কামনায়

RAHMAN GROUP

আলহাজ মোঃ ফজলুর রহমান
চেয়ারম্যান রহমান গ্রুপস্

ফজলুর রহমান এ্যান্ড কোঃ (প্রাঃ) লিঃ
রহমান হোসিয়ারী ডাইং এ্যান্ড ফিনিসিং মিলস্ (প্রাঃ) লিঃ
অলিম্পিয়া নিটিং ইন্ডাষ্ট্রিজ (প্রাঃ) লিঃ
রহমান হোসিয়ারী গার্মেন্টস্ (প্রাঃ) লিঃ
রহমান কোয়ালিটি গার্মেন্টস্ (প্রাঃ) লিঃ
জেসী হোসিয়ারী গার্মেন্টস্ (প্রাঃ) লিঃ
জনতা ফ্যাব্রিকস্ (প্রাঃ) লিঃ
রহমান নিটিং এ্যান্ড ইয়ার্ন প্রসেসিং ইন্ডাষ্ট্রিজ (প্রাঃ) লিঃ

হেড অফিসঃ নাহার ম্যানসন ফাষ্ট ফ্লোর
১৫০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা-১০০০
ফ্যাক্স ৮৮০-২-৮৬৩৯৫৩
টেলেক্স ৬৩২১৬০ FRCPL BJ
ফোনঃ ঢাকা ৮৬৩৯৫৩, ২৪১১৮৮, ২৪৪৩৬৭
ফ্যাক্টরীঃ ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ
ফোনঃ ৭৬৬২৯, ৭৬২৫৭, ৭৬৪৮৯, ৭৬৬২১

কারুপল্লী

কারুপল্লীতে উপজাতীয় মেয়ের কাপড় বুনন

ঐতিহ্যবাহী হা–ডু–ডু খেলা

মোরগের লড়াই

বাউল গান

পালকিতে বর কনে

ফাউন্ডেশনে নৌ বিহার

ফাউন্ডেশনের নৈসর্গিক দৃশ্য

ঐতিহ্যবাহী হস্ত ও কারুশিল্প বিকাশে শিল্পাচার্যের ভূমিকা

বিশ্বনাথ সরকার
গবেষণা অফিসার

গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য প্রাচীনকাল থেকে অনেক প্রতিকুলতায় বিচিত্রতর ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে নিজস্ব সত্ত্বা ও স্বকীয়তায় টিকে আছে। অবহেলিত গ্রাম বাংলার নিরক্ষর শিল্পীদের হস্তশিল্প জন জীবনের নিত্য ব্যবহার্য্য পণ্য সামগ্রীতে ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের আসল রূপ ফুটে উঠেছে। এই শিল্পই গ্রাম-বাংলার, আনাচে-কানাচে, অযত্নে অবহেলায় ছড়িয়ে রয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প সম্ভার বিলোপ হতে চলছে, অথচ এই শিল্প সম্ভারই আমাদের দেশের জাতীয় ঐতিহ্যবাহী গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এই শিল্পকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেন প্রথমে শিল্পচার্য জয়নুল আবেদিন। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী হস্ত ও কারুশিল্পকে সংরক্ষণ ও বিকাশের প্রয়োজনে শিল্পাচার্য্য জয়নুল আবেদিন ১৯৫৬-৫৭ সালে তৎকালীন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় জাপান সফরে গিয়ে একটি সিরামিক শিল্প নগরী পরিদর্শন করেন। শিল্প নগরীটি ছিল জাপানের মহাসড়ক থেকে কিছুটা অভ্যন্তরে প্রাকৃতিক পরিবেশে বিরাট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। সকল দর্শনার্থীদেরকে কর্মরত শিল্পীদের পোশাক পরিয়ে দেয়া হচ্ছে দেখে, শিল্পাচার্য্যের কৌতুহল বেড়ে গেল। শিল্প নগরীর ভিতর প্রবেশ করতেই শিল্পাচার্য্যকেও কর্মরত শিল্পীদের পোশাক পরিয়ে দেয়া হলো। উৎফুল্ল চিত্তে শিল্পাচার্য্য চারিদিকে তাকাচ্ছেন, শিল্পী ও দর্শনার্থী সকলের একই পোষাক, শুধু পার্থক্য দর্শনার্থীগণ প্রদর্শন করছেন আর শিল্পীগণ কাজ করে যাচ্ছেন। আনন্দময় শৈল্পিক পরিবেশে শিল্পচার্য্য সমগ্র এলাকা ঘুরে দেখেন এবং কর্মরত শিল্পীদের সাথে একান্ত আপন মনে, মত বিনিময় করেন। অতঃপর সফরের অভূত-পূর্ব সাফল্য ও ধারণা নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ।

স্বদেশে ফিরেই শিল্পাচার্য্য লোক ও কারুশিল্পকে বিকশিত করার প্রয়াসে অধিক আগ্রহে চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। তিনি গ্রাম বাংলার সাধারণ শিল্পীদের অতি নিকটে গিয়ে এই বোধ, উপলব্ধি এবং অনুধাবন করেন। এই শিল্পকে রক্ষা না করলে অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এই ভাবনায় তিনি নিজে থেকেই ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পসমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং পুনরুজ্জীবনের জন্য লোকশিল্প যাদুঘর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। এই যাদুঘরে ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের ব্যাপক প্রচার ও গবেষণা হবে এবং যাদুঘরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে কারুশিল্প গ্রাম (শিল্পীদের বসতি)। এই লোকশিল্প যাদুঘর প্রসঙ্গে শিল্পাচার্য্য বলেন।

"আমরা বাঙালীরা আমাদের গৌরবময় পরিচয় হারিয়ে ফেলছি। দেশী জিনিষের কদর আমরা ভুলে যেতে বসেছি। সত্য সুন্দর মনের অভাবে বাংলাদেশে চলেছে রুচির দুর্ভিক্ষ। শতকরা কুড়ি ভাগ লোকের মতামত এবং উপলব্ধিকে ভয়ে অথবা ভয় পাওয়ার আনন্দে গ্রহণ করছে শতকরা আশি ভাগ লোক। বহু দেশ ঘুরেও আমি বাংলার ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য ও এদেশের মত অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনেকের কোথাও দেখতে পাইনি। অথচ এই সুন্দরের উপলব্ধি আজ কাছে ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

আমরা ভুলে যাচ্ছি আমরা শিল্পীর জাতি। বিদেশীরা লুটে নিয়ে গেছে আমাদের অতীতের স্মৃতি বারবার। আজও নিয়ে যাচ্ছে। নবাবগঞ্জের কাঁথার যে প্রতীকধর্মী নকশা ও মাছ-পাখি-হাতী ফুল লতাপাতার সমাবেশ রয়েছে, ফ্রান্সের মিউজিয়ামে তা নিয়ে গবেষণা হয়। দেশের লোক হয়ে আমরা যা চিনি না, বা জানি না, বিদেশে গিয়ে এ দেশ থেকে প্রাপ্ত সে সব সামগ্রীর সযত্ন সংগ্রহ দেখেছি বিভিন্ন যাদুঘরে।

অনেক দেরী হয়ে গেছে এমনিতেই, আজ এখনি, পদক্ষেপ নিতে হবে সবাইকে। সরকারী সহযোগিতার মাধ্যমে বাঁচাতে হবে আমাদের লোকশিল্পের নিপুন কারিগরদের, স্থাপন করতে হবে লোকযাদুঘর।" বাংলার এক গৌরবময় যুগে সোনারগাঁ তথা সুবর্ন গ্রাম দেশী বিদেশী এবং পর্যটকদের মিলন ক্ষেত্র হিসেবে পরিগনিত হয়েছিল। এ সোনারগাঁ থেকেই সেই সুক্ষ্ম মসলিন শাড়ীসহ বিভিন্ন প্রকার ঐতিহ্য - বাহী হস্ত ও কারুশিল্প রপ্তানী হতো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। এক সময় গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ এ সোনারগাঁতে তার মসনদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ফলে এ অঞ্চল ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা এক সমৃদ্ধ জীবন হিসেবে সুখ্যাতি বিস্তার করেছিল। শিল্পচার্য্য জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর ঐতিহ্যবাহী হস্ত ও কারুশিল্পকে বিকাশের প্রয়োজনে সোনারগাঁকে উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্বাচিত করেন। পরবর্তী কালে সরকারের মনোযোগ ও ঐকান্তিকতার ফলে ১২ই মার্চ ১৯৭৫ সালে এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পকে সংগ্রহ সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন এবং গ্রামীণ বর্তমান কারুশিল্পকে উৎসাহ প্রদানের প্রয়োজন হয়ে পড়ায় ১৫০ বিঘা জমির উপর বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সোনারগাঁও সম্পর্কে শিল্পাচার্য্যের নিজের লেখা থেকে পাওয়া যায়-"বাংলার মানুষ গ্রাম ভিত্তিক, বাংলার মূল সংস্কৃতি গ্রামকেন্দ্রিক, বাংলার সমাজ ঐশ্বর্য্য গ্রামের কৃষাণ, কুটির শিল্পী। ইদানিং বহু নগর কেন্দ্রিক বৃহৎ শিল্প এ দেশে গড়ে উঠেছে সত্য কিন্তু বাংলার মুখের আদর পাওয়া যায় কুটির শিল্পেই, বাংলার মসলিন, জামদানী, অলংকার কারুকার্য, এমনকি সাধারণ আসবাবপত্রেও বাঙ্গালীর শিল্প মনের পরিচয়। শুধু শিল্পগুলো মহান তাই নয়, একদা এই সব কুটির শিল্পের অর্থনৈতিক মূল্য ছিল প্রচুর। ক্ষয়িষ্ণু হলে এখনও এদের আর্থিক মূল্য রয়েছে। শৈল্পিক কারণে সৌন্দর্য বোধের প্রয়োজনে এবং গ্রাম বাংলার অসংখ্য মানুষের কর্ম সংস্থানের কামনায় এ দেশে লোকজ শিল্পের গ্রাম (Folk Art Industrial village) স্থাপনের প্রয়োজন প্রচন্ড।"...একটি সুন্দর শিল্পগ্রাম সুকুমার শিল্পকে গ্রামীন শিল্পকে পালন করবে, শাশ্বত সৌন্দর্য বোধকে এ যুগে সবার সামনে তুলে ধরতে পারবে। দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকরা এসব একান্ত বাংলার গ্রাম দেখতে পারবে। পর্যটককে আকর্ষণ করা ছাড়া

তৈরী জিনিষ বিক্রী করেও দেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে। তাছাড়া বাংলার ঐতিহ্য রক্ষা করার দায়িত্বও আমাদের রয়েছে। বাংলার লোক শিল্প কলার ঐতিহ্য যেমন মহান তেমনি আমাদের আকাঙ্খা এমন একটি গ্রাম স্থাপন করার যা শিল্পগ্রাম সোনারগ্রাম হিসাবে আরো শত শত গ্রামের আদর্শ বলে বিবেচিত হবে। এইটি যেমন সর্বরকম কুটির শিল্পের প্রাণ কেন্দ্র হবে তেমনি লোকজ শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতির সাথে নিয়ে যাবার প্রয়োজনীয় প্রেরণা জোগাতে এই গ্রাম সাহায্য করবে। এই গ্রামকে যথাযথই সোনারগাঁ বলবো"। (জয়নুল আবেদীন-আব্দুল মতিন, আহম্মদ, পাবলিশিং হাউজ-৭ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪)।

লোকশিল্প যাদুঘর এবং লোক শিল্প গ্রাম প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন দেখেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল লোকশিল্প যাদুঘরসহ একটি বিশাল খোলা শিল্পগ্রাম বা ওপেন এয়ার শিল্পগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা। যে শিল্পগ্রামে প্রবেশ করলে এক নজরে দেখা যাবে ছোট একটি বাংলাদেশ, শৈল্পিক বাংলাদেশ; কিন্তু তাৎপর্যে হবে মোহনীয়, দেশবাসী আর বিশ্ববাসীকে যা একসঙ্গে আমন্ত্রণ জানাবে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী আর বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের তৈরী হাঁড়ি পাতিল কলস থেকে শুরু করে ময়মনসিংহের নকশী পিঠার গড়ন ও গঠন সকলের চোখে তাক লাগিয়ে দিবে। শিল্পাচার্য গর্ব করে বলতেন, বাংলাদেশের নিরক্ষর মানুষ কয় রকমের ফর্ম বা গড়ন জানে, একবার শুধু চোখ মেলে দ্যাখো। আরো বলতেন জামদানী শাড়ীর পাড় এবং তার ডিজাইন তৈরী করেছে বাঙ্গালী কারিগর। জামদানীর পাড়ের নকশাসহ বিভিন্ন শিল্প সামগ্রীর রূপ, গড়ন, গঠন আর ডিজাইন দেশী-বিদেশী সকলকে মুগ্ধ করে। লোক শিল্পের কোনো উদাহরণ শুধু নিছক শিল্প নয়, তা অতি দরকারি জিনিস বটেই। লোকশিল্প একেবারে জাতীয়তাবাদী প্রেরণায় সংগৃহীত হয়েছে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন এবং কবি জসীম উদ্দীন ছিলেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী এবং রোমান্টিক। তাঁরা ব্যক্তি নয়, গোটা জাতিটাকে জননীর মতো স্নেহাদরে গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশকে ঘনিষ্ঠ প্রেমিকের মত উদগ্রীবভাবে ভালোবেসেছিলেন। সেজন্যই বাংলাদেশের কথা উঠলে উভয়ে থামতে চাইতেন না। গ্রাম বাংলার চিত্র ফুটিয়ে তুলতেন বিভিন্ন জিনিসের মাধ্যমে। এ দেশের রূপরস গন্ধ তাঁদের হৃদয়কে দলিত মথিত করে দিয়েছিল বলে তাঁরা ছিলেন বাংলার দরদী শিল্পী। আমাদের লোক শিল্পের নিদর্শন হচ্ছে, নকশী কাঁথা, মুখোশ, পট-চিত্র, কুলা, লক্ষ্মীর সরা মনসা ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি সম্বলিত ঘট, বিয়ের পিঁড়ি, দেয়ালচিত্র, আল্পনা, পুঁথি চিত্র, পাটা, নকশী পুতুল, কাঠখোদাই, উলকি, কাঠের বিভিন্ন রকমের কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ নকশী বা পাকোয়ান পিঠে, পাখা, শীতল পাটি, নকশী শিকা, নকশী ছাঁচ, মিছরির মঠ, শাড়ী ছই ও পালকি, পুথির থলে ও লাঠি, অলংকার শিল্প, কাপড় চোপড়, মসলিন (জামদানি) লোহা, পিতল ও কাঁসার কাজ এবং পাতের কাজ, ফেলিগ্রি বা তারের কাজ, ধাতু পাত্রের উপর বিভিন্ন ধাতুর অলংকরণের কাজ, প্রস্তরের উপর কারু কাজ, সামগ্রিকভাবে মৃৎশিল্প, কাঠ শিল্প, প্যানেল ও গম্বুজের কাজ, কাঠ রঙ্গীন করার শিল্প। কুদিকারের শিল্প যেমন আইভরির কাজ, যেমন মেষের শিং, ঝিনুক, কচ্ছপের খোলা, শংখ, সজারুর কাঁটা, মাছের আঁশ, পালক এবং পশম প্রভৃতির কাজ, চর্মশিল্প, বই বাঁধাইয়ের মুসলিম শিল্পীদের কাজ, লাষা শিল্প, মীনার কাজ, ডিজাইন বুনন এবং সীবনের কাজ, ফুলকারী ও চিকন কাজ প্রভৃতি। হাজারো শিল্প ও শিল্পী বাংলার আনাচে-কানাচে অবহেলায় অযত্নে রয়েছে যার পুনঃ জাগরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে। গত বছর সর্ব প্রথম ৩ দিনব্যাপী জাতীয় পর্যায়ে লোকজ উৎসব সু-সম্পন্ন হলো। গতবারের লোকজ উৎসব বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে এতে করে দেশবাসী হারিয়ে যাওয়া লোকজ শিল্প সামগ্রীর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছেন অনেকটা। লোক শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত শিল্পীগণও পেয়েছেন অনুপ্রেরণা। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০শে নভেম্বর, ৯২ থেকে ফেব্রুয়ারী, ৯৩ পর্যন্ত এবারও শুরু হয়েছে ৩ মাসব্যাপী শিল্পগ্রাম কর্মসূচী, লোকজ অনুষ্ঠান জাতীয় পর্যায়ের লোকজ উৎসব এবং কারুশিল্প মেলা। শিল্পগ্রাম কর্মসূচীর আওতাধীনে ইতিমধ্যে ১০টি দোচালা এবং চৌচালা ছনের ঘর নির্মিত হয়েছে এছাড়া রয়েছে বিরাটকার একটি টিনের ঘর অর্থাৎ পুরো এলাকাটি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ ঘর-বাড়ীর মত তৈরী করা হয়েছে। এক কথায় বলা চলে এটা একটি কারু শিল্পগ্রাম। এখানে আগত শিল্পীগণ ঐতিহ্যবাহী জামদানী শাড়ি, ঝিনুকের কাজ, মৃৎশিল্প, বাঁশ-বেত শিল্প, কাঠের তৈরী বিভিন্ন ধরনের পুতুলসহ অন্যান্য শিল্প সামগ্রী তৈরী করবেন, একই সাথে আগত দেশী-বিদেশী পর্যটক-দর্শনার্থীগণ শিল্পীদের নিজ হস্তে তৈরীকৃত শিল্প সামগ্রী যেমন দেখতে পাবেন তেমনি পছন্দনীয় শিল্প সামগ্রী ক্রয় করতেও পারবেন।

প্রতি শুক্রবারের লোকজ অনুষ্ঠানে থাকছে সমস্ত দিনব্যাপী আবহমান বাংলার প্রচলিত জীবন যাত্রার প্রদর্শনী। বিকেল ৩টায় গ্রামীণ খেলাধুলা এবং সন্ধ্যে ৫ টার লোকজ সঙ্গীত। এছাড়াও ৭(সাত) দিন ব্যাপী জাতীয় পর্যায়ের লোকজ উৎসব ও কারুশিল্প মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এসময় ফাউন্ডেশনের চত্বর থাকবে কোলাহল মুখর এবং সমস্ত দিন রাত্রিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং মেলা থাকবে ঐতিহ্যবাহী পণ্য সামগ্রীতে ভরপুর। অর্থাৎ পুরো ৩ মাসব্যাপী ফাউন্ডেশন চত্বর থাকবে উৎসবমুখর।

বর্তমানে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক দেশী বিদেশী সকলের নিকট লোক ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক তুলে ধরা এবং ঐতিহ্যবাহী হস্ত ও কারুশিল্পকে অধিকতর উৎসাহ দেওয়া কাজে বিভিন্ন সুদুর প্রসারী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। যা দেশী ও বিদেশী পর্যটক ও দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে এবং আমাদের ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয় হবে। সেজন্য এ ব্যাপক কর্মসূচীর আয়োজন। শিল্পাচার্যের স্বপ্ন ছিল এখানে একটি জাতীয় পর্যায়ের লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা এবং একটি আদর্শ লোক শিল্পগ্রাম গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যেই বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশেন ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।